



## কাজী নজরুলের প্রবন্ধে দেশ ও সমাজভাবনা

মানস জানা<sup>†</sup>

সংক্ষিপ্তসার:

বিশ শতকের দুইয়ের দশকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্য জগতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। এই নতুন যুগের আলোড়ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, শোষণ-নিপীড়নের বেদনাকে সাহিত্যে রূপ দিতেই যেন এগিয়ে এলেন তিনি। বিষয়, ভাব ও যুক্তির প্রাবল্যে তাঁর প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। শুধু তাই নয়, এই প্রবন্ধগুলি একটি সময়ের দলিল। তাঁর প্রবন্ধ ও অভিভাষণ প্রায় একশো'র কাছাকাছি। সংখ্যাটা খুব নগণ্য নয়। এর অনেকগুলি সাক্ষ্য দৈনিক 'নবযুগ', অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', সাপ্তাহিক 'লাজল' পত্রিকায় সম্পাদকীয় আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলা, বিচারবোধ, মননশীলতা, নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। তাঁর রচনামূল্যের আর একটি দিক হল, প্রবন্ধের বিন্যাস, পরিচ্ছেদ বিভাজন এবং ভাবের প্রবাহে কোথাও বাধা সৃষ্টি করেননি। এই প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে।

সূচক শব্দ: হিন্দু - মুসলমান সম্পর্ক, সাম্যবাদ, বাংলার বিপ্লববাদী আন্দোলন, জন সাহিত্য, ভারতীয় রেনেসাঁস

I

ভূমিকা

বিশ শতাব্দীর সূচনা থেকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক, কৃষক বিশেষত শিক্ষিত জনসাধারণকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লববাদী আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রাশিয়ায় প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এদেশেও শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। বিশ শতকের দুইয়ের দশকের শেষ দিকে বাংলা সাহিত্য জগতে কাজী নজরুল

<sup>†</sup> Associate Professor in Bengali, Panskura Banamali College (Autonomous), West Bengal, India.

ইসলামের আবির্ভাব। এই নতুন যুগের আলোড়ন, আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, শোষণ-নিপীড়নের বেদনাকে সাহিত্যে রূপ দিতেই যেন এগিয়ে এলেন তিনি। ভারতীয় নবজাগরণের যৌবনোদ্দীপ্ত ধারার চিন্তা তাঁর সৃষ্টিকে করেছে মহান। কাজী নজরুলের সৃষ্টি নিয়ে বিভ্রান্তি বিস্তর। তাঁর সৃষ্টি-সম্ভার যদিও কম নয়, তাহলেও গান ও কবিতা নিয়ে যত আলোচনা হয়, প্রবন্ধ, নাটক-নাটিকা, গল্প ও উপন্যাস ধরে আলোচনা হয় তুলনায় কম। তাঁর প্রবন্ধ এবং অভিভাষণগুলিকে একসঙ্গে রেখেই সমালোচকরা আলোচনা করেন। কারণ, নজরুলের সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এবং সাংবাদিকতার কাজের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। বিষয়, ভাব ও যুক্তির প্রাবল্যে প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট আলোচনার দাবি রাখে। শুধু তাই নয়, এই প্রবন্ধগুলি একটি সময়ের দলিল হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেবে। আলোচনার সুবিধার্থে, বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তাঁর দেশভাবনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকেই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

## II

### নজরুলের মতাদর্শ

কাজী নজরুলের প্রবন্ধ, আলোচনা ও অভিভাষণ প্রায় একশো'র কাছাকাছি। সংখ্যাটা খুব নগণ্য নয়। এর অনেকগুলি সাক্ষ্য দৈনিক 'নবযুগ', অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু', সাপ্তাহিক 'লাজল' পত্রিকায় সম্পাদকীয় আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তা 'যুগবাণী', 'রুদ্রমঙ্গল', ও 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থগুলিতে স্থান করে নেয়। 'যুগবাণী' যদিও ব্রিটিশ সরকার দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। 'নবযুগ' নিয়ে এসেছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গমক। আর 'লাজল' রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবহে সাম্যবাদী চিন্তার দ্বারা রঞ্জিত।

নজরুলের প্রবন্ধগুলির ভেতর প্রবেশ করতে গেলে জানতে হবে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ। ভারতে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের রুশ বিপ্লব ভীতি থেকে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্কে আতঙ্ক ছিল তীব্র। স্বদেশী আন্দোলন বা অসহযোগ আন্দোলনের চেয়ে বাংলার বিপ্লবী কর্মকাণ্ড তথা জাতীয় বিপ্লববাদের প্রতি শাসক শ্রেণির নজর ছিল অপেক্ষাকৃত কড়া। শুরুর দিকে যৌবনের আবেগ এবং ব্রিটিশ শাসন - শোষণের প্রতি ঘৃণা থেকে জাতীয় কংগ্রেসের একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নজরুল নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু এখানে থেমে থাকতে তিনি পারেন না। যে আগুন তাঁর হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত ছিল, অত্যাচার - মিথ্যার সঙ্গে তা কখনও আপস করতে পারে না। ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেছিলেন শুধু আবেগ ও সংগ্রামী চেতনা থেকেই,

তা কিন্তু নয়। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান। জমিদার, নায়েব, গোমস্তাদের অত্যাচারে তখন প্রজার প্রাণ হয়ে উঠত ওষ্ঠাগত। স্বাধীনতার আকৃতি নিয়েই বিদেশি দ্রব্য বর্জন থেকে কারাবরণ, অনশন ইত্যাদি কোনো কিছুকেই নজরুল ছোটো করে দেখেননি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ভুল-ভ্রান্তি, ব্যর্থতা, দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে সেই নজরুল কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এমনকি গান্ধীবাদের উপরেও আস্থা হারালেন। অহিংস আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। ১৯২১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ধুমকেতুর সম্পাদকীয়তে স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, সর্বপ্রথম, ধুমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

নজরুল সাম্যবাদী মতাদর্শের অনেক কাছাকাছি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও, সাম্যবাদের আস্থা-বিশ্বাস তৈরি হলেও, তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমেদ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ তিনি নেননি। কিন্তু তিনি যে শ্রমিক - কৃষকদের মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত রাখতে চান, তা প্রকাশ পায় শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দলের অন্যতম সংগঠক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। নজরুল প্রথাসিদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্মকে নিজ ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেননি। ধর্মের নিহিত সত্য, ধর্মের কল্যাণকর রূপই ছিল তাঁর ধর্ম। সেজন্য অনায়াসে নামাজ, রোজা, উপাসনার রীতি-নীতি জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে ভয় পাননি। কামাল পাশার প্রসঙ্গ টেনে বলেছিলেন, দাড়ি রোজা রেখে, গোস্তু খেয়ে যে দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য। মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল অংশের মধ্যে নজরুলের এই সমস্ত বক্তব্য তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মনুষ্যত্ব, মানবতা, মানব কল্যাণ-- এসবই আসলে ছিল নজরুলের ধর্মবোধের মৌল ভিত্তি।

### III

#### কাজী নজরুল ও মুসলমান সমাজ

কাজী নজরুল ইসলামের নিজের কথায় তাঁর সাহিত্য চিন্তা বিষয়ক ভাবনা তুলে না ধরলে, সামগ্রিকভাবে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য বোঝা যাবে না। তিনি বলেছিলেন, "আমি এই দেশে, এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি

তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।" (ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৪৭৭)

বাঙালি মুসলমান সমাজের কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অন্ধতা দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন নজরুল। বাংলার মুসলমান সমাজকে, বিশেষত তরুণদেরকে জ্ঞানে-কর্মে ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। বাংলার তরুণ শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছিলেন। এমন উদ্বুদ্ধ যে কেউ করতে পারেন না। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারা বলতে কি বুঝায়, তা তরুণদের তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা কী? দুর্বলতা, ভীৰুতা, জড়তা, হীনমন্যতা কীভাবে কাটিয়ে উঠতে হবে, যথার্থ মর্যাদাময় জীবন বলতে কি বুঝায়, জীবনে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অর্থ কি, এসব কথাগুলো সেদিন মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের সামনে তাঁকে তুলে ধরতে হয়েছে। মুসলমান যুব সম্প্রদায় তাঁকে সেদিন সাদরে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বড় বড় চরিত্র সামনে থাকা সত্ত্বেও, কেন নজরুলই যুব সম্প্রদায়ের কাছে এতখানি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন -- তার উত্তরও এখানেই নিহিত আছে। সেই অধিকার তিনি অর্জন করেছিলেন। যুব সমাজকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা তৎকালে নজরুলের মতো খুব কম দেশনেতার ছিল। হিন্দু- মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছে নজরুল ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। একাধারে কবি, গায়ক এবং দেশসেবক। কখনও কখনও মুসলমান যুবকদের ভীৰুতা, দুর্বলতা, পশ্চাৎপদতার জন্য তীব্র শ্লেষ - ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করেছেন। কারণ, নিজ সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ের দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থা, হতাশা নজরুলকে মর্মে মর্মে আঘাত করেছিল। তিনি এই সমাজকে ভালোবেসেছিলেন, শোষণ - নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের উদ্বুদ্ধ করতে কখনও বা হিন্দু যুবকদের প্রশংসা করেছেন। মূলত তা এই যুব সমাজকে আন্দোলিত করার জন্য। বলেছেন, যশ, খ্যাতি, লোভ, স্বার্থপরতা-- এসব দিয়ে হবে না। এই সমাজে উন্নত সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। চাকুরীর মোহের মধ্যে তাদের আটকে রাখতে চাননি। তাদের মেরুদণ্ডহীন করে রাখতে চাননি। তাদের অস্থিমজ্জায় যথার্থ প্রাণ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। কী গভীর আবেগ নিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, তা সত্যিই শিক্ষণীয়।

নজরুল যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, কণ্ঠ - সংগীতে, রাগ-রাগিণীতে, যন্ত্রসংগীতে যারা যথার্থই গুণী, তারা তো প্রায় সকলেই মুসলমান। অথচ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, চিত্রশিল্পী নাই কেন? পশুর মতো কেবল সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে কী হবে, যদি গৌরব করবার মতো কিছু না থাকে?

বাংলার শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করতে, সর্বোপরি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আস্থাভাজন করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন নজরুল। এভাবেই বাঙালি মুসলমান শিক্ষিত যুবকদের স্বাধীনচিন্তার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। বাঙালি মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যের আপনজনে পরিণত করার দায়িত্ব নজরুলকেই নিতে হয়েছিল। নাহলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বিভাজন হয়ে যেতে পারতো। সে সম্ভাবনা তো দেখা দিয়েছিলই। বাংলা সাহিত্যে কি হিন্দুদেরই প্রাধান্য থাকবে! এমন ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করে, রাশ টেনে ধরে, হতাশা দূর করলেন। বাংলা সাহিত্য যে হিন্দু - মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বাংলা সাহিত্যের মূল স্রোতের অভিমুখী করে তুললেন শিক্ষিত মুসলমান সমাজকে। কেবল ইসলামী কাহিনি ও গৌরব গাথা তুলে ধরা নয়, হিন্দু পুরাণ, দেবদেবী প্রসঙ্গ নিয়ে এসে মুসলমান পাঠক সমাজকে ভাবালেন। যুক্তবেণী সাহিত্য ভাবনায় একটা বৃহৎ পরিসর উঠে এলো। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই কর্মকাণ্ড কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ দায়িত্ব নজরুল ছাড়া আর কেউ পালন করেননি। অন্য কারও পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না।

#### IV

#### নজরুলের প্রবন্ধে সাহিত্য -- সাহিত্যিক ও সমাজ

মানুষের জীবনকে সুন্দর ও উন্নততর করার প্রয়োজনেই শিল্পের সৃষ্টি। শিল্প তাই জীবনের রসরূপ প্রকাশ। সত্যের সঙ্গে যখন আনন্দের যোগ ঘটে, তখনই শিল্পের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়। শিল্পীর কাজ হল জীবনসত্যকে খুঁজে পাওয়া। এই জীবন কোনো না কোনো আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের দ্বারা সীমায়িত। জাগতিক অন্য সব কিছুর মতোই মানবজীবনও সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সম্পর্ককে জেনে-বুঝে সেই অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করার মাধ্যমে রচিত হয় সভ্যতার ইতিহাস। আমাদের শিল্পকলার বেশির ভাগ বড়ো কীর্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামলব্ধ জ্ঞান বা চিন্তা থেকেই রসধৌত হয়ে এসেছে। সামাজিক মননশীলতার ঘাত-প্রতিঘাতের জটিল প্রক্রিয়ার একীকরণের (integration) পথেই সমাজমনন গড়ে উঠেছে। সমাজমননের ভেতর ও তার বাইরের দ্বন্দের মধ্য দিয়েই বিকাশ লাভ করেছে মানুষের ভাবজগত। শিল্প সৃষ্টির চিন্তাও এই ভাবজগতেরই ফসল। যদি একথাই ধরা হয়, শিল্পী তাঁর অন্তর্লোকের তৃপ্তির জন্যই ব্যক্তিচিন্তার উপলব্ধির ভিত্তিতে শিল্প সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করেন, তাহলেও এই মন সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিভাবনা কোনো না কোনো সমাজচিন্তা, সমাজভাবনার ব্যক্তিকৃত রূপ। তাই সমাজ-বাস্তবকে অস্বীকার করে

অথবা এড়িয়ে গিয়ে অন্তর্লোকের তাগিদ এবং পরিতৃপ্তিতে মগ্ন থাকা সত্য সম্পর্কে উদাসীনতা বা অজ্ঞতার নামান্তর।

শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির এই মূলগত ভাবনাকে সামনে রেখেই নজরুলের সাহিত্য ও জীবনাচরণের মূল্যায়ন আবশ্যিক। নজরুল সমাজ নিহিত সত্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়-" সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোনো ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়ো-ছোটো জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আঁতুড় ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না।..."

তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট'-এর অর্থ' সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাঝেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়। আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।" (ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৭) সাহিত্য সম্পর্কে এই মৌলিক বক্তব্য তুলে ধরেছেন "বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান" প্রবন্ধে। তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন, বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেছে। মুসলমান তরুণ লেখকদের লেখা দেখে তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই লেখকরা বাংলা সাহিত্যে বহু উচ্চ আসন পাবেন। মুসলমান সমাজের কাছে ভিন্ন কোনো মত বা স্বজাতি সম্পর্কে আবেগের কথা নয়, তুলে ধরলেন বিশ্ব সাহিত্য সৃষ্টির কথা, সাহিত্যে সর্বজনীনতার কথা। বলেছেন, কীভাবে সাহিত্যিক নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলবেন।

সত্য উদঘাটনে নজরুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন শাসক - শাসিতের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল সেদিন, যেদিন থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক সম্পদকে কিছু মানুষ গায়ের জোরে আপনার করতে চেয়েছে। যারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে পেরেছে, সম্পদের উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে-তরাই মালিক, প্রভু, শাসক। দাসতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র পর্যন্ত সব সমাজই এই শ্রেণীদ্বন্দের আবর্তে-আবর্তিত হচ্ছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সহ ব্যক্তিমননের নানা দিক, যেমন স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-দয়া সবই সমাজবাহিত এই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তা কোনো না কোনো শ্রেণির চিন্তা হতে বাধ্য।

শাসক ও শাসিত দু'ধরনের শ্রেণির চিন্তাই সমাজে সর্বদা ক্রিয়াশীল। একটি চিন্তা হল-- সাধারণভাবে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে মানুষ বাস করে, তাকে টিকিয়ে রাখা বা স্থিতিবস্থা বজায় রাখার পক্ষে। আর অন্যটি হল, তাকে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থেকে সৃষ্ট চিন্তা। সাহিত্যিক শ্রেণিগত অবস্থানের প্রশ্নে শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাই শোষিত মানুষের মর্মযন্ত্রণায় তিনি নিজেকে সামিল করতে চান। বঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষের বাঁচার দাবিই সেকারণে তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নেয়। যদিও অনেক সময়ই যে কোনো কারণেই হোক, সাহিত্যিক বাকচাতুরীর আড়ালে এমনভাবে আত্মগোপন করেন-- যার মধ্য থেকে সত্যকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সত্যের এই অপলাপ যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি করতে পারে না। সত্যকে বিকৃত করা বা অস্বীকার করার জন্য যে কত ধরনের পস্থা সৃষ্টি করা হয়, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধে বলেছিলেন, "দেখতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন-- সত্যকে তাহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা এমনকি তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই, যাহাতে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়, চিন্তের কোনোপ্রকার চাঞ্চল্য না দেখা দেয় এমনি।.... কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি?" (চট্টোপাধ্যায়, শরৎ রচনাবলী, ৩য় খন্ড, নাথ পাবলিশিং, পৌষ ১৪০১) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি 'রাজবন্দীর জবানবন্দীতে নজরুলও বলেছিলেন, "আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। .... এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো, একি সত্য সহ্য করতে পারে?" (ইসলাম, ২০০৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম খন্ড, পৃ: ৪৬২) নজরুলের কবিতায়, গানে রাজদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। শোষিত জনগণের হাতে এ সুর সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ারে পর্যবসিত হয়েছে। অনেকে এই সাহিত্যকে প্রচারধর্মী বলে, চড়া সুরের বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু যা সমাজ বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, সমাজ অভ্যন্তরে নিহিত সত্যকে তুলে ধরে, তাকে শুধুই প্রচারধর্মী আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। নজরুল সাহিত্য সমাজের সঙ্গে অস্থিত অর্থনীতি, রাজনীতিকে তুলে ধরে আর এই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, মেহনতি মানুষের ঘামে-অশ্রুতে সিঁক্ত।

নজরুল তাঁর বিখ্যাত 'ছুঁমার্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন, "মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া কখনও কোন কার্যে পূর্ণ সাফল্য লাভ হয় না।...

হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঠে দাঁড়াইয়া-  
- মানব! -- তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বল দেখি, 'আমার মানুষ ধর্ম।' দেখিবে,  
দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে।... মানবতার এই মহা-যুগে একবার গম্ভী  
কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ-- তুমি  
সত্য।" (ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০)

নজরুল গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, হিন্দু- মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হল এই ছোঁয়াছুঁয়ির জঘন্য  
ব্যাপারটা। নজরুল বারবার আশ্বস্ত করেছেন, প্রত্যেকেই তার তার নিজের ধর্মের সত্যকে জানুক। নিজের  
ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলে, অন্য সকলকে বিশ্বাস করার শক্তি পাবে। আর অন্য মানুষকে ঘৃণা করে তারাই,  
যাদের নিজের কোনো ধর্ম নাই। এই উদারতায় নবীনদেরকেই আহ্বান করেছেন তিনি। জাতীয়তাবাদী  
আন্দোলনে সেই দুর্বলতা, বিদ্বেষ, বিভেদের সাংঘাতিক রূপ তিনি দেখেছিলেন। রাগে - ক্ষোভে বলেছিলেন,  
"কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কী বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে?" (ইসলাম,  
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০) নিজেকে সংযত করতে পারেননি। বলেই দিলেন,  
শুনিয়া হাসি পায়। একটি অখণ্ড জাতিসত্তা গড়ে তোলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক কাজটিই যে অপূরিত থেকে  
গিয়েছে নজরুল তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। বিভেদের বীজ ছিল দেশ-নেতাদের আচরণে, অভ্যাসে। সেই  
বিভেদকে কাজে লাগিয়ে দেশে দাঙ্গা, হানাহানি চলেছে। সাম্প্রদায়িকতার রঙে রঞ্জিত হয়ে দেশের রাজনীতি  
মানুষের রক্তের হোলি খেলায় নামাতেও দ্বিধা বোধ করেনি। ইতিহাসের সেই ভ্রান্তি আজও কাটানোর চেষ্টা  
এদেশে হয়নি। নজরুল কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও আশা ছাড়েননি। সেই মহা আহ্বান জানিয়ে গিয়েছেন  
বারেবারে।

তাঁর রচিত 'সত্য শিক্ষা', 'জাতীয় শিক্ষা' ও 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' রচনাগুলিতে কিশোরদের, তরুণদের কাছে  
আহ্বান রেখেছিলেন দেশকে ভালোবাসা, দেশের প্রতি আবেগ কীভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন। সেজন্য বীরের  
আত্মত্যাগ, নির্ভীকতা অর্জন করতে হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি মেনে নিয়েছিলেন।  
কিন্তু কোথাও যেন ভণ্ডামি, অমঙ্গল প্রবেশ না করে। লিখেছেন, আমাদের স্বার্থের মায়া ত্যাগ করে সত্যকেই  
বড়ো করে দেখতে শিখতে হবে। আমাদের আগে মানুষ হওয়ার সাধনায় নিজেদের যুক্ত হতে হবে। তবেই কি

না আমরা কোনো বড়ো কাজে হাত দিতে পারবো। দেহ- মন উভয়কেই গড়ে তোলার উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন নজরুল।

V

### নজরুল: মিলিত সাধনার মূর্ত প্রতীক

নজরুলের আগে হিন্দু এবং মুসলিম পরস্পর বিরুদ্ধ নিজ সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ ভাবনা সেকুলার রেনেসাঁস ভাবনার পথরোধ করে যাচ্ছিল বারবার। তাই নজরুলের পথ চলা ছিল দুর্গম গিরি অতিক্রম। কাব্য থেকে জীবন সর্বত্র এই অসম্প্রদায়িক ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সমস্ত প্রস্তুতিই তিনি নিয়েছিলেন। কাব্যে বিষয়, ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রয়োগ সর্বত্রই এক মিলন সাধনার সাধক হয়েছিলেন প্রাণের তাগিদে।

"ছন্দের ক্ষেত্রে নজরুল প্রধানত সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অনুগামী হলেও আরবী পারসী প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী ছন্দ তিনি বাঙলায় আমদানি করেন। ভাষার বিষয়ে আরবী, ফারসী, দেশী, গ্রাম্য কথা ইত্যাদি নানা রকমের শব্দসম্ভার ব্যবহার করে নজরুল বাঙলা ভাষাকে যে বলিষ্ঠ, দৃঢ় ও পৌরুষদীপ্ত রূপ দিয়েছেন তার তুলনা মেলা ভার। সত্যেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল এ বিষয়ে নজরুলের পূর্বসূরী হলেও তিনি যে তাঁদের বহুলাংশে অতিক্রম করে গেছেন সে কথা অনস্বীকার্য। কোমলকান্ত ও ললিতমধুর বাঙলা কবিতার ভাষা যে এত সংগ্রামশীল ও শক্তিশালী হতে পারে, তা নজরুলের কবিতা না পড়লে বোঝা যায় না। ( গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ: ৩৪৪) নিঃসন্দ্বিগ্ন চিত্তে এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভাষা-ছন্দ-অলংকারে এবং রসসৃষ্টিনৈপুণ্যে নজরুল হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য রচনা কী কেবল ছন্দ ও ভাষার জ্ঞান এবং কলাকৌশলের দক্ষতা আয়ত্ত করতে পারলেই সম্ভবপর হবে? এ প্রশ্নে নজরুলের উপলব্ধির গভীরতা ও অনুভবশীলতার দিকটিকে স্পষ্ট করেছেন কালিদাস রায়। "কেবল উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেই এটা সম্ভব হয় না। কাজীর চেয়ে উভয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে হয়তো অনেকের ঢের বেশী জ্ঞান আছে কিন্তু উভয় সংস্কৃতির প্রতি এত দরদ, এত উদার সর্ব-সংস্কারমুক্ত মন আর কার আছে? প্রকৃত কবির চিত্ত সর্ব-সংস্কারমুক্ত। কাজী সে চিত্তের অধিকারী বলেই কাব্যের দরবারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাতে পেরেছে। ( ফজল, রচনাবলী, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৫৩৮) কাজী নজরুল সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত এই মূল্যায়নগুলিকে সামনে রাখতে হয়। সমকালীন আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই

নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তত্ত্বগত ভাবনা কবিতার মধ্যে যুক্ত করার কৃতিত্ব বাংলা কাব্যে নজরুলেরই। আধুনিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তা জাগরণের, অনুপ্রেরণা ও আশার কথা বলে। নজরুলের কাব্য-সঙ্গীত-প্রবন্ধ সেই সংগ্রাম, সম্ভাবনা ও জীবনাকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে।

VI

### উপসংহার

শব্দ চয়ন, চিত্রনির্মাণ ক্ষমতা, মনোগ্রাহী কল্পনা, নাটকীয়তা, রূপরচনা, উপমা ব্যবহার, পুরাণের অনুষ্ণ ইত্যাদি সৃষ্টিতে নজরুল ছিলেন এক পাকা কারিগর। সমালোচকদের মতে, নজরুল উচ্ছ্বাসপ্রবণ, তাঁর রচনামূল্যে বাঁধুনির অভাব। যদিও যুক্তির নিরিখে নজরুলের প্রশ্নে সবাই তা মেনে নেবেন না। প্রশ্ন আসে, শৃঙ্খলা মেনে চলা, ভাবের সংযম রক্ষা, উচ্ছ্বাসের নিয়ন্ত্রণ থাকলেই কি সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? নজরুল নিজেই এগুলো ভেঙেছেন। তা ভেঙেছেন শিল্পীর মেজাজ নিয়েই। নতুন করে গড়তে গেলে তো ভাঙতে হবেই। পুরনো মৌতাতে আটকে না থেকে, মোহময় শৃংখল-জাল ছিন্ন করে নজরুল নিজে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। তার উত্তেজনা, অস্থিরতা, উন্মাদনায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন অনেকেই। এ তো হওয়ারই কথা ছিল। নজরুলের সমস্ত সৃষ্টির মূলে ছিল বন্ধন মুক্তির আবেগ এবং প্রতিস্পর্ধা। প্রতিবাদের গমক সৃষ্টিতে যেমন যেমন শব্দ-বাক্যের প্রয়োজন হয়েছে, তেমন তেমন ভাবেই সেগুলিকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছিলেন। তাঁর আমিত্বকে চেনাতে পেরেছিলেন। এভাবেই আধুনিকতার জয়গান গেয়েছিলেন। এই নজরুলকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তি-শৃঙ্খলা, বিচারবোধ, মননশীলতা, যা একান্তই কাম্য, তার রসময় প্রকাশ নজরুলের প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। প্রবন্ধের বিন্যাস, পরিচ্ছেদ বিভাজন এবং ভাবের প্রবাহকে গতিশীল করে দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কোথাও বাধা সৃষ্টি করেননি। তাই তাঁর প্রবন্ধাবলী বাংলা সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা তুলে এনেছে। জাতি, সমাজ, রাজনীতির দ্বন্দ্ব- সংঘাত, শোষণ - নিপীড়ন, পরাধীনতার গ্লানি, আত্মযজ্ঞা, সংস্কৃতি ও মানবতাবাদের সুর খুঁজে পেতে নজরুলের এই প্রবন্ধগুলি সাহায্য করবে।

**তথ্যসূত্র:**

- ১। ইসলাম, ন. (২০০১)। প্রত্যভিভাষণ, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড ,পশ্চিমবঙ্গ বাংলা  
আকাদেমি।
- ২। ইসলাম, ন.(২০০৫)। যুগবাণী, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা  
আকাদেমি।
- ৩। চট্টোপাধ্যায়, শ .(পৌষ ১৪০১)। শরৎ রচনাবলী, ৩য় খন্ড, নাথ পাবলিশিং।
- ৪। গুপ্ত, ড ,সুশীলকুমার .(১৯৯৭)। নজরুল চরিতমানস, দে'জ পাবলিশিং ।
- ৫। ফজল আ. (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। রচনাবলী, ১ম খন্ড, চট্টগ্রামবইঘর । ,